দুর্নীতিই

তৃণমূল

বিজেপি-র

নীতি

দুর্নীতিই তৃণমূল বিজেপি-র নীতি

সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয়া-উদারনীতি, ধান্দার গ্রাসে গোটা অর্থনীতি । দুর্নীতি ক্রমেই যেন প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারের মদতেই। দুর্নীতি ও শাসকদল-কর্পোরেট চক্রের রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সহাবস্থান– বর্তমান আর্থিক নীতির নির্মম দস্তুর। নির্বাচন ও ক্ষমতা ছিনতাইয়ের সেরা অস্ত্র, সেরা কৌশল– পেশী, রাষ্ট্রশক্তি, আর অবৈধ অর্থ। সর্বত্রই দুর্নীতির চরিত্রে 'ধান্দার ধনতন্ত্র'ও স্পষ্ট। কর্পোরেট-রাজনীতিবিদ-আমলা-পুলিশের এক অবৈধ আঁতাতের চক্র। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে 'দুর্নীতি'ই যেন হয়ে উঠেছে রাজনীতির কারবারিদের অন্যতম পুঁজি। দুর্নীতির বহর যার বেশি, দলবদলের বাজারে কদরও তাঁর বেশি। তৃণমূল ও বিজেপি– দুই শাসকদলের এই কদর্য চেহারা সামগ্রিকভাবে রাজনীতি সম্পর্কেই একাংশকে অনীহার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

২০১৪ সালে বিজেপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ''ভ্রষ্টাচারমুক্ত ভারত'' বানাবে। পৃথিবীতে দুর্নীতি পরিমাপক সংস্থা ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ৯ ডিসেম্বর দুর্নীতি-বিরোধী দিবসে রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছে, এশিয়ার মধ্যে 'সর্বোচ্চ ঘুষের হার ভারতে'। এই দুর্নীতি ছড়িয়েছে সর্বত্র। সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন বিনষ্ট করলে এই দুর্নীতি বাড়বেই। ১৫ বছর ধরে 'তথ্যের অধিকার' ছিল দুর্নীতি ফাঁস করার

হাতিয়ার। 'তথ্যের অধিকার' আইনকে মোদী সরকার একটানা আক্রমণ করে এই হাতিয়ারকেই ভোঁতা করে দিয়েছে। ২০১৯ সালে বিরোধীদের তীব্র বাধার মধ্যেই মোদী সরকার এই আইনের সংশোধন করে আরটিআই কমিশনারদের স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে খর্ব করে কমিশনের কাজেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

২০১১ সালে সংসদে 'ক্ষোভ প্রতিকার বিল' আনা হয় যাতে গ্রাম-শহরের যেকোনো মানুষের ক্ষোভ ও অভিযোগ প্রতিকারের জন্য বিরাট বৈধ কাঠামো তৈরি করা যায়। বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এলে এই বিল পাশ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। উল্টোটাই হয়েছে, এই বিল বাতিলই করা হয়েছে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ২০১৪ সালে লোকপাল আইন পাশ হয় সংসদে। এই আইনকেও বরবাদ করেছে মোদী সরকার। উচ্চ পদাধিকারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যবস্থা ছিল এই আইনে। তাদের সম্পত্তি আয় প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল আইনে। আইনের এ সংক্রান্ত সংশোধনী এনে বাতিল করেছে। লোকপাল ও তার সদস্যদের উপযুক্ত নিযুক্তি হয়নি। নিযুক্তি কমিটি সরকার প্রভাবিত, তাতে লোকপালের স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু থাকে না। নিয়বিধিও তৈরি হয়নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে একজন লোকপাল সদস্য পদত্যাগ করেছেন। রাফালে প্রতিরক্ষা চুক্তি, ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির মতো মেগা-দুর্নীতির অভিযোগকে কার্যত মাঠেই মারা হয়েছে।

ফলে দুর্নীতির প্রশ্নে দুই শাসক দলের মধ্যে 'বিরোধ' নেই বললেই চলে! সামাজিক মাধ্যমেও এখন জনপ্রিয় ক্যাচলাইন– ''ফুল বদলে লাভ কী, মুখ তো একই''। দুর্নীতির উর্বর জমি তাহলে তৃণমূলই। আর দুর্নীতি করে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হলো বিজেপি। এটাই যেন হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে এই বাংলার দস্তুর। মিডিয়ার পর্দায় প্রতিদিনকার 'ব্রেকিং নিউজ'– তৃণমূল ছেড়ে নেতারা ভিড়ছেন বিজেপি'তে। ২০১১ সাল থেকে এ'বাংলায় দলবদলকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। খাস নবান্নে গিয়েছে, অন্য দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ছবি দেখেছে এরাজ্য। দলত্যাগীদের তালিকা লম্বা হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও প্রতি বিকালে তৃণমূল ভবনে অন্য দল থেকে ভাঙিয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ানোর সাংবাদিক বৈঠক হতো নিয়ম করে। এখন উলটো স্রোত। 'উন্নয়ন

যজ্ঞে' শামিল হতে অন্য দল থেকে প্রলোভন, মিথ্যা মামলার ভয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ানো নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন সেই স্রোত বিপরীতমুখী। নতুন এই প্রবণতার ভরকেন্দ্রই হলো দুর্নীতি। দলবদল আসলে দুর্নীতির রঙের বদল।

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়েছে। রাজ্যে কর্মসংস্থান, শিল্প বিনিয়োগ, নিয়োগ, কৃষির সঙ্কট, শিক্ষার নৈরাজ্য সব ইস্যুকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাকসিটে ফেলে সামনে আনা হচ্ছে দলবদলের সুবিধাবাদী রাজনীতির ছবি। যে বিজেপি নেতার সারদা থেকে নারদ কাণ্ডে তৃণমূলকে দুষতেন, সেই বিজেপি নেতারাই সাদরে বরণ করছেন সারদা-নারদা খ্যাত(কু) তৃণমূলী নেতাদেরই। খোদ কলকাতায় এসে সভা করে অমিত শাহ বলেছিলেন, ''বিজেপি-কে পাঁচ বছরের জন্য সরকার গড়ার সুযোগ দিন, যারা তোলাবাজি করে, দুর্নীতি করে (চিটফান্ড কেলেঙ্কারি) তাদের সবাইকে চুন চুনকে জেলে ভরার কাজ করবে বিজেপি''। চুন চুনকে জেল না ভরে বিজেপি'তে ভরার কাজই এখন করছেন অমিত শাহ। কর্পোরেটের অনুগত ভৃত্যের ভূমিকা-পালন-করা বিজেপির মুখে তাই 'দুর্নীতিমুক্ত' সরকার উপহার দেওয়া রাজ্যবাসীর কাছে নির্মম উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। খোদ অমিত শাহের পুত্রের সংস্থা কীভাবে ধান্দার ধনতন্ত্রের অনিবার্য পরিনামে ফুলে ফেঁপে উঠেছে সে সম্পর্কে নীরব থেকে যে এরাজ্যের ভাইপো সাংসদের দুর্নীতিতে সোচ্চার হলে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায় না তা বাংলার মানুষের অভিজ্ঞতাতেই স্পষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালের ৩৪ বছরের 'দুর্নীতির' তদন্ত হবে। শাস্তি দেওয়া হবে বামফ্রন্ট সরকারের দোষীদের। সরকার গঠনের ৬ মাস পরে এই লক্ষ্যে সরকার বিশেষ অডিট টিমও তৈরি করেছিল দপ্তরে দপ্তরে। মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছিলেন, অডিটে ত্রুটি ধরা পড়লেই সি আই ডি তদন্ত করানো হবে। জেলে পাঠানো হবে বামফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রীদের। আড়াই বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে জানা যায়, উল্লেখযোগ্য কোনো ত্রুটিই খুঁজে পাওয়া যায়নি। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই বিশেষ অডিটের কাজ। সরকার ও প্রশাসনে দুর্নীতিরোধে ২০০৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে লোকায়ুক্ত গঠন করেছিলো। লোকায়ুক্তের চেয়ারম্যান নিযুক্ত

হয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমরেশ ব্যানার্জি। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পরে সেই লোকায়ুক্ত আর সক্রিয় নেই। তৈরি হয়েছে লুঠের অবাধ সুযোগ।

মোদীর 'দুর্নীতি-বিরোধী' অভিযানও বাছাই করা। বিরোধীদের দমনে ডাইনী খোঁজা পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিরাট বিরাট দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিজেপি নেতাদের সাতখুন মাফ। যেমন, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা, খনির লোহা চুরিতে অভিযুক্ত কর্ণাটকের বেলারী ভ্রাতারা, আসামের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যাকে বিজেপি বলেছেন গুয়াহাটি জল কেলেঙ্কারিতে প্রধান অভিযুক্ত, মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহানের ব্যাপন কেলেঙ্কারি, সারদাস্নাত মুকুল রায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালের বিরুদ্ধে জমি ও জলবিদ্যুৎ কেলেঙ্কারি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুত্রের হঠাৎ বেড়ে ওঠা সম্পত্তি, মহারাষ্ট্রের নারায়ণ রাণে এরকম অসংখ্য শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্ব।

এরাজ্যে তৃণমূলের তৈরি করে দেওয়া দুর্নীতির উর্বর জমিতেই ফুটছে পদ্মফুল। করোনা আবহে লকডাউনে রেশনের চাল চুরি থেকে আমফানের ত্রিপল চুরি, ক্ষতিপূরণের টাকা নয়ছয় থেকে করোনা পরীক্ষার কিট– বাদ যায়নি কোনকিছুই। অন্যদিকে কয়লা থেকে বালি, গোরু পাচারের তদন্তেও উঠে আসছে শাসক দলের নাম। যদিও গত ছয় বছর ধরে পরিকল্পিতভাবে সারদা থেকে রোজভ্যালি– স্বাধীনতার পরে এবাংলার সবথেকে বড় আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত শ্লথতার অভিযোগ। চার্জশিট জমা দিতে পারেনি সিবিআই। দীর্ঘসূত্রিতার রেশ ধরেই জনমানসে দুর্নীতির ভয়াবহ ছবিকে ফিকে করে দেওয়া হচ্ছে।

যারা আরটিআই আইন অনুযায়ী প্রামাণ্য অভিযোগ জানতে চেয়েছে, তাদের অনেককে খুন হতে হয়েছে, ১৮ জন এভাবে খুন হয়েছে শুধু ২০১৮ সালেই। এদের নিরাপত্তার ২০১৪ সালে আইন হয়। কিন্তু আইন প্রয়োগের কোনো নিয়মবিধি তৈরি না করে মোদী সরকার এই আইনকে অকেজো করে দিয়েছে। দুর্নীতি-বিরোধী

সবকটি আইনকেই করে দেওয়া হয়েছে পঙ্গু। নোটবন্দী ও নির্বাচনী বন্ড দিয়ে দুর্নীতি দমনের বাগাড়ম্বর করেছে সরকার। তাতে দুর্নীতি ও কালো টাকা বৈধ হয়েছে। সিন্দুক ভরেছে শাসকদলের। দুর্নীতিগ্রস্ত ও আর্থিক অপরাধীদের দলে টানতে ব্যবহার করছে সরকারি তদন্ত সংস্থাগুলিকে।

তাকানো যাক এরাজ্যের দিকেই। উন্নয়নের জোয়ার কতটা তা নিয়ে অনন্ত প্রশ্নের মাঝেই সামনে আসছে দুর্নীতির জোয়ার বইছে নবান্ন থেকে তৃণমূল ভবনের অন্দরে। তারই কিছু ছবি তুলে ধরা হলো।

দুর্নীতির দলবদল...

সারদা কাণ্ডে কার্যত প্রথম থেকেই যে তৃণমূল নেতার নাম সবচেয়ে বেশিবার সামনে এসেছে তিনি হলেন মুকুল রায়। সারদা কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পরে তৃণমূল ভবনে বিক্ষোভরত সারদার এজেন্টদের সঙ্গে বৈঠক করা থেকে শুরু করে ২০১৩ সালের ৫ই এপ্রিল নিজাম প্যালেসে সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে বৈঠক, ২০১২ সালের মার্চে কালিম্পঙের ডেলোর বৈঠক, সুদীপ্ত সেন ফেরার থাকাকালীনই দিল্লিতে সারদা কর্তার সঙ্গে বৈঠক, এমনকি সুদীপ্ত সেন ফেরার থাকার সময় সারদার কাগজ ‘কলম’র দপ্তরে গিয়ে টাকা দিয়ে আসা-প্রতিটি ঘটনার তথ্য প্রমাণ, ছবি-সহ হাতে এসেছে সি বি আই’র তদন্তকারী আধিকারিকদের। সারদা কাণ্ডে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তদন্তে সেই তথ্যের কোন উল্লেখ যদিও নেই রিয়েলটি মামলার কোন চার্জশিটে।

ভায়া তৃণমূল এখন তিনি বিজেপি’র সর্বভারতীয় নেতা। সিজিও কমপ্লেক্স থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসছেন মুকুল রায়। ২০১৫ সালের ৩০শে জানুয়ারি। সি বি আই জেরার মুখে পড়েছিলেন তখন তৃণমূলের ‘সেকেন্ড ইন কম্যান্ড’ মুকুল রায়। এরাজ্যের বুকে সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তের গতিপথ সেদিনই ঠিক হয়ে যেতে পারতো। হয়নি। তারপর চার বছর কেটেছে, ছয় বছরের জন্যও আর তলবের মুখে পড়তে হয়নি তাঁকে। মুকুল রায়ের জেরা তাই সারদা তদন্তের সন্ধিক্ষণ!

তারপর থেকেই কখনও চড়াই কখনও উতরাই, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হচ্ছে তদন্ত। 'সি বি আই জাগছে', 'সি বি আই শীতঘুমে যাচ্ছে'- পাঁচ বছরের সময়কালে বারেবারে 'শিরোনাম' হয়েছে এমনই! জেলে গিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এতদিনে ফের স্বমহিমায় মদন মিত্র, ভোটের টিকিট মেলার আশাও রয়েছে। জেলে গিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কাগজ আর মোহনবাগান ক্লাব নিয়ে স্বমহিমায় সৃঞ্জয় বসু। জেলে গিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফের লোকসভায় দুর্নীতি নিয়ে বেমালুম বক্তব্যও রাখছেন সুদীপ বন্দোপাধ্যায়। 'ভাগ মুকুল ভাগ' বলা মুকুলই এখন অমিত শাহের বিশ্বস্ত সেনাপতি।

এই বিজেপি আদপেই কী তৃণমূলের দুর্নীতির অবসান ঘটাতে পারে? এই বিজেপি আদপেই রাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত সরকার গড়তে পারে? হালফিলের দলবদলের তালিকা বলছে, না। কখনই পারে না।

বাস্তবতা বলছে অন্য কথা। বিজেপি'তে অন্য দল থেকে লোক টানার জন্য যেন শীতকালীন অফার দুর্নীতি কালো রঙ নিয়ে কেশব ভবনে ঢুকুন একবারে বেরোবেন সাদা হয়ে, সব দুর্নীতি ধুয়ে যাবে গো-মূত্রে।

প্রমাণ শুভেন্দু অধিকারি। নারদ কাণ্ডে হাত পেতে ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছিল। নিয়ম করে বিজেপি'র সভায় বলছেন, 'তোলাবাজ ভাইপো, চাল চোর ত্রিপল চোর তৃণমূল'। পালটা তৃণমূলের 'যুবরাজ' ভাইপো সাংসদ নিয়ম করে মিটিঙে বলছেন, 'আমাকে তোলাবাজ বলছে, কাগজে মুড়ে টাকা নিতে কাকে দেখা গেছে, নারদের ভিডিওতে কারা ছিল?' অভিষেক ব্যানার্জির মন্তব্যে যদিও দলের মধ্যেই চাপে সুব্রত মুখার্জি থেকে বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। বামপন্থীরা বিশেষত সিপিআই(এম) নারদ কাণ্ড ফাঁসের প্রথম দিন থেকে বলে আসছে, অভিযুক্ত বারোজন তৃণমূল নেতা, মন্ত্রী ও একজন আইপিএস-সহ ১৩জনের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। সাংসদ-বিধায়করা প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়ার পরেও তাঁদের সদস্যপদ কেন খারিজ হবে না? বিধানসভার স্পিকার থেকে লোকসভা স্পিকার– চুপ সকলেই। লালকৃষ্ণ আদবানিকে মাথায় রেখে তৈরি

এথিক্স কমিটি গত চার বছরে একটি বৈঠকও ডেকে উঠতে পারেনি। এখন তৃণমূলে থেকে যাওয়া নারদ অভিযুক্তরা বিজপিতে চলে যাওয়া নারদ অভিযুক্তদের দিকে আঙুল তুলছেন।

অথচ গত ১৭ মাস ধরে প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে পড়ে আছে একটি ফাইল। স্রেফ একটি সইয়ের অপেক্ষায়।

শাসক তৃণমূলের তিন সাংসদ ও এক প্রাক্তন মন্ত্রী (শুভেন্দু অধিকারি)র বিরুদ্ধে দুর্নীতির ধারায় আইনী প্রক্রিয়া চালু করার সিবিআই'র আবেদন গত সতের মাস ধরে ফেলে রেখেছে মোদী সরকার। এমনকি মমতা ব্যানার্জির ছবি দুর্নীতি কাণ্ডের আইনী প্রক্রিয়ার আবেদনও ফেলে রাখা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জির ফাইল ফেলে রাখা মুলত দর কষাকষির জন্য সেটা এরাজ্যের মানুষ গত ছয় বছর ধরে সারদা-রোজভ্যালির তদন্তের অগ্রগতিতেই বুঝেছেন। সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের(সিভিসি) রিপোর্ট বলছে ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গোটা দেশে একাধিক দুর্নীতির মামলায় (ব্যাঙ্ক, এমনকি সরকারী দপ্তরের দুর্নীতি) জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিক-সহ ১১০ জনের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া শুরুর সম্মতিটুকু পর্যন্ত আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ, জন-অভিযোগ মন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকা এই মন্ত্রক ১২ জন আই এস আধিকারিক এমনকি পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, ইউ বি আই'র দুর্নীতি যুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কোন আইনী প্রক্রিয়া, মামলা শুরুর আবেদন আটকে রেখেছে। তালিকায় রয়েছেন তৃণমূলের দমদমের সাংসদ সৌগত রায়, হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি, বারাসতের কাকলি ঘোষদস্তিদার ও রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী বর্তমানে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারি।

সেই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারি তৃণমূলকে হটিয়ে এরাজ্যে 'দুর্নীতিমুক্ত' সরকার উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিলোচ্ছন সভার পর সভায়। পদ্মফুলের রোড শো'তে হাঁটছেন নারদা থেকে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির তদন্তে অন্যতম অভিযুক্ত শোভন চ্যাটার্জি। সামনে আরেক বিজেপি'র রত্ন মধ্যপ্রদেশের কৈলাস।

পিরামিডের মাথায় একজনই....

দুর্নীতি আর তৃণমূলের মধ্যে ফারাক করা কার্যত দুষ্কর হয়ে উঠছে। সারদা থেকে ত্রিফলা, এস জে ডি এ' কেলেঙ্কারি থেকে গম বীজ কেলেঙ্কারি, কয়লা, গোরু পাচার, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাতেও কেলেঙ্কারি-দুর্নীতি হয়ে উঠেছে তৃণমূল সরকারের শ্রী! তালিকা বিরাট, বাছাই করা কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

চিটফান্ডের টাকা মমতা ব্যানার্জির আঁকা ছবির হাত ধরে ঘুরপথে ঢুকেছিল শাসক তৃণমূলের তহবিলে। চিটফান্ড কাণ্ডে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'র তদন্তে সিবিআই তদন্তের অভিমুখও ছিল এমনটাই। সেই তদন্তে একাধিকজনক জেরা করা হয়েছে ইতিমধ্যে, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বিক্রি করা একাধিক ছবিও। অথচ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে মমতা ব্যানার্জির ছবি বিক্রির তদন্তের দায়িত্ব থাকা আধিকারিককেই সম্প্রতি বদলি করা হয়েছে। ছবি বিক্রি কাণ্ডে নির্দিষ্ট অসঙ্গতির তথ্য প্রমাণ হাতে আসার পরেও তাই তদন্ত নতুন করে একচুলও এগোয়নি গত প্রায় ১৬মাস ধরে।

শপথ নেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে না বসতেই মহাকরণে নিজের অফিসঘরটি তাঁর পছন্দমতো সাজানো শুরু হয়। দাবি করেছিলেন, এর জন্য ২ লক্ষ টাকা তিনি দিয়েছেন সরকারকে। কিন্তু পূর্ত দপ্তরের হিসাব, সে বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা! প্রশ্ন উঠেছিল, মুখ্যমন্ত্রী সরকারের যেখানে কোনো টাকা নেন না, তাঁর নিজেরও যেখানে কোনো সম্পত্তি নেই, সেখানে বলা মাত্রই দু' লক্ষ টাকা কীভাবে দিয়ে দিলেন তিনি? আরও তাৎপর্যের, মুখ্যমন্ত্রীর ২ লক্ষ টাকা সরকারের কোন তহবিলে জমা পড়লো, তা আজও কেউ জানাতে পারেননি।

দুর্নীতির শঙ্কা জুগিয়েই পথচলা শুরু, আজ তা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেয়েছে।

শাসক দলের ভূমিকা বাদ দিয়ে এস জে ডি এ কেলেঙ্কারির তদন্তও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও মুশকিল, তা টের পাচ্ছে ইডি'ও। সারদা'র মত এক্ষেত্রেও মমতা ব্যানার্জির সরকারের অবস্থান দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা অভিযুক্তদের পক্ষেই। ২০০কোটি টাকার এস জে ডি এ-র দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে তদন্ত শুরু হয় শিলিগুড়ির

পুলিস কমিশনার কে জয়রামনের নেতৃত্বে। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে শিলিগুড়ির পুলিস কমিশনার সামান্য সক্রিয় হতেই মুখ্যমন্ত্রীর কোপে পড়েন কে জয়রামন!

এরপরেই ত্রিফলা কেলেঙ্কারি। কলকাতাকে 'লন্ডন' বানাতে ত্রিফলা আলো বসানো শুরু হয়। কেবলমাত্র বরাত প্রক্রিয়াতেই কর্পোরেশনের বড় রকমের দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। 'খেলা' কয়েক কোটি টাকার, নারদা স্টিং'র ফুটেজে অ্যান্টিচেম্বারে বসে টাকা নেওয়া মেয়রের দিকেও অভিযোগ।

সরকারে বসার তিনমাসের মধ্যেই ৭কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করে কৃষকদের খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল মা-মাটি-মানুষের সরকার। এমনকি সেই দুর্নীতির কথা ফাঁস করে দিয়েও মমতা ব্যানার্জির রোষানলে পড়তে হয়েছিল 'মন্ত্রী' রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে।

এরপরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ফরম বিলি থেকে এস এস সি, মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগেও দু-হাতে টাকা তুলছে তৃণমূলীরা। আবার কখনও প্রযোজক ভেঙ্কটেশ মোহতার সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে রাজ্য সরকারের ২৪ কোটি টাকা ক্ষতিও বেমালুম স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

আড়াই হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। রোজভ্যালির পরিমান ১৫হাজার কোটি। দুটি মিলিয়ে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। আর লাভবান? সারদ কাণ্ডে একসময় জেলে থাকা এক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের দাবি, সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগীর নাম মমতা ব্যানার্জি।

একটা কেলেঙ্কারিতে দলের লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে ১৫জন সাংসদ হয় জেরার মুখে পড়েছে নতুবা গ্রেপ্তার হয়েছে। তালিকায় রয়েছে মন্ত্রী থেকে দলের দাপুটে নেতাও। কার্যত গোটা দল ডুবে আছে কেলেঙ্কারিতে। মাথা সেই মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। ১কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার নিজের আঁকা ছবি সারদা কর্তার কাছে বিক্রির করা থেকে ডেলোর বৈঠক– সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুণ্ডুর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য আড়াল করা যাচ্ছে না।

২০১১'র বিধানসভা নির্বাচনকে তৃণমূল 'পরিবর্তনের ভোট' বলেই বর্ণনা করে। জানা গেছে, সেই ভোটে স্রেফ বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই গরিব আমানতকারীদের টাকা সারদা কর্তা সুদীপ্ত অবলীলায় খাটিয়েছিলেন শাসক দলের নির্বাচনী প্রচারে। টাকার অঙ্কও বিশাল। ইতোমধ্যে সারদার টাকায় বিধানসভা ভোটে লড়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সদ্য সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূলী বিধায়কও! সারদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এতই ছিল তৃণমূল নেত্রীর যে, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সারদার সঙ্গে চুক্তিও করে ফেলেছিলেন। অথচ ২০১৩ সালের এপ্রিলে তিনি মহাকরণে দাঁড়িয়ে বলেছেন, পয়লা বৈশাখে সারদার চ্যানেলের কর্মীদের চোখ দেখে তিনি প্রথম বিষয়টি জানতে পারেন!

শুধু সাংসদ, মন্ত্রী আর নয়, গোটা তৃণমূল কংগ্রেসকেই অভিযুক্তের কাঠগড়ায় তুলে নোটিস দিয়েছে সি বি আই। চার বছরে তৃণমূলের আয় ব্যয়, কত টাকা ডোনেশন পেয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিক্রির টাকার হিসাব আসতে হয়নি। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এলাকায় এলাকায় তৃণমূলের বিপুল প্রচার খরচের হিসাব চাইছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

তবে শুধু সারদা-রোজভ্যালিতেই ক্ষান্ত নন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের তদন্তের আওতায় থাকা প্রায় ১৭১টি সংস্থাকে 'ছাড়' দেওয়ার শর্তে তহবিল ভরাচ্ছে, সূত্রের দাবি এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই তোলা হয়েছে প্রায় ৩০০কোটি টাকা। মন্ত্রী, সাংসদরা তাদরকির দায়িত্বে, তবে পিরামিডের মাথায় সেই একজনই!

হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এখন ব্যানার্জি পাড়া...

আধ কিলোমিটারের মধ্যে ৩৫টি প্লট। কোথাও জমি, কোথাও ফ্ল্যাট বাড়ি। ৩৫টি প্লটের মালিকানাই একটি মাত্র পরিবারের হাতে।

এই কলকাতা শহরে এমন কোনও পরিবার আছে যারা জাদুকাঠির ছোঁয়ায় মুড়ি মুড়কির মতো তাদের জমি, বাড়ির সংখ্যা শুধুই বাড়িয়ে যেতে পারে? জমি দখলের ইতিবৃত্তেই স্পষ্ট রাজ্যের সবচেয়ে 'প্রভাবশালী' পরিবারের কীর্তি! একদিকে

কালীঘাট মোড় থেকে কালীঘাট রোডের সপ্তপল্লি ক্লাব পর্যন্ত। অন্যদিকে কালীঘাট মোড় থেকে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ৪৪ কলোনি পর্যন্ত। বিস্তীর্ণ এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত ৩৫টি প্লট চলে এসেছে সেই পরিবারের হাতে।

পরিবারের অন্যতম সদস্যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাদা, ভাইদের দখলেই এখন কার্যত হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট ও কালীঘাট রোডের সিংহভাগ এলাকা। শহরের এই প্রান্তের অনুপ্রেরণার ছোঁয়ায় একের পর এক পরিবার হয় জমি বেচে দিচ্ছেন নতুবা জোর করে উচ্ছেদের মুখে। জমি মাফিয়ার শহুরে সংস্করণ কী হতে পারে তার ভয়াবহ উদাহরণ হয়ে উঠছে ক্রমেই এই তল্লাট। কালীঘাট মোড় থেকে ৪০০ গজ দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে এমন ১৭টি প্লট যার প্রত্যেকটির দখলদারি এখন ব্যানার্জি পরিবারের হাতে। ঠিকানা সব পাশাপাশি। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ঠিকানায় ২৯ সি, ২৯ডি, ৩০ এ, ৪৫ এ, ৪৫ ডি, ১২ নম্বর, ৮২ বি, ৮০ এ। কালীঘাট রোডে ৪৯সি, ৬৩/৮, ৭৬/৩। এছাড়াও ৩ নম্বর পার্বতী চক্রবর্তী লেন, ২৪-২৫ রানি শঙ্করী লেন। এই প্রতিটি প্লটের কোনটা এখন কার্তিক ব্যানার্জি, কোনোটা অজিত ব্যানার্জি, কোনটা স্বপন ওরফে বাবুন ব্যানার্জির নামে বা দখলে। মাত্র ৪০০ গজ দূরত্বেই একটি পরিবারের একাধিক সদস্যের ১৭টি জমি বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট।

গোটা রাজ্যে জমি কারবারের 'অনুপ্রেরণা' কোথা থেকে আসছে তা নিয়ে সন্দেহের আর অবকাশ নেই।

এই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ৩০/বি, রাজ্যবাসীর কাছে পরিচিত ঠিকানা, মমতা ব্যানার্জির বাসভবন। ঠিক তার গায়ে লাগানো পাশের জমিটির ঠিকানা ৩০/এ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। এর পিছনে দিয়েই বয়ে গেছে আদি গঙ্গা। বন্দরের জমি। বন্দরের জমির সেই পিলার অতিক্রম করেই বেবাক বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে আদি গঙ্গার একাংশ। মুখে কুলুপ পরিবেশবিদদেরও। এতটাই 'প্রভাবশালী' পরিবার। সেখানেই উঠেছে দোতলা বাড়ি। বাড়ির ছাদে মোহনবাগানের রঙে কংক্রিটের নৌকা। বাড়ির মালিক কে? মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন ব্যানার্জি। মোহনবাগানের

ফুটবল সচিব, বেঙ্গল হকি সংস্থার সচিবও তিনি। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টালিনালার একাংশ বুজিয়ে পোর্ট ট্রাস্টের জমিতেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাঁর দোতলা নৌকা বাড়ি।

আশ্চর্য জাদু আছে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে! 'বিশ্ব বাংলা' লোগোর আবেদন আসে এই ঠিকানা থেকেই। এই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটেই সেই প্রভাবশালী ব্যানার্জি পরিবারের লাগোয়া বাড়িতে বসেই রমরমিয়ে চলত চিট ফান্ড। এই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ঠিকানাতেই চলে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে উত্থানের সেই সংস্থা 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'। ২০০৯ সালে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈদিক ভিলেজে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা, হামলা, খুনের অভিযোগে আন্দোলনে নামলেন মমতা ব্যানার্জি মাত্র তিন বছর পরেই জামিনে মুক্ত সেই রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১কোটির ১৫ লক্ষ টাকা 'কমিশন মানি' ঢুকেছিল লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে। যার ঠিকানাও সেই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট-ই!

সেই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটই এখন এক পরিবারের একচেটিয়া দখলদারি। দশকের পর দশকের মাথা গোঁজার ঠাঁই বেমালুম ছেড়ে দিচ্ছে বা হস্তান্তর করে দিচ্ছে একাধিক পরিবার, আর তা চলে আসছে ব্যানার্জি পরিবারের দখলদারিতে– কোন অনুপ্রেরণার স্পর্শে ঘটছে এমন ঘটনা?পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে না। একটি মাত্র ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, অভিযোগকারী যুবক কয়েকপ্রস্থ হামলার শিকারও হয়েছেন, মামলাও চলছে হাইকোর্টে। কার্যত দু'টি রাস্তার সিংহভাগ চত্বরের নামে যেন ব্যানার্জি পাড়া হয়ে উঠছে ক্রমেই।

'হাওয়াই চটির মানে/ প্রসূন দত্ত জানে'....

দলনেত্রী তখন রেলমন্ত্রী। তাই রেলে চাকরী পাবার আশায় টাকা ঢেলেছিলেন ৩৪ বছর বয়সী হুগলির বাঁশবেড়িয়ার তৃণমূল কর্মী প্রসূন দত্ত। মেলেনি চাকরী, তবুও আশা নিয়েই এসেছিলেন হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, দলনেত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে। দেখা

হয়নি, চাকরী পাওয়ার আশাও নেই। দলকে টাকা দিয়ে বেবাক প্রতারিত হয়েছেন।

মমতা ব্যানার্জির বাড়ির পিছনের খালের ধার বরাবর থাকা একটি জেনারেটরের পাশের রাখা ছিল এক ড্রাম ভর্তি তেল। সেই তেল গায়ে ঢেলে আগুন জ্বেলে দেন তিনি।

দলনেত্রীর কাছে প্রতারণার বিহিত না পেয়ে চাকরীর মিথ্যা আশায় স্বপ্ন দেখা এক যুবক সেদিন হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে এসেই গায়ে আগুন দিয়েছিলেন। 'হাওয়াই চটির মানে/ প্রসুন দত্ত জানে'।

সেটা কী ছিল? তাঁর দপ্তরে চাকরী পাবার আশায় কাকে কাটমানি দিতে হয়েছিল?

জেলায় জেলায় ছোট-বড়-মাঝারি তৃণমূল নেতাদের বাড়ি, অফিসে বিক্ষোভ আছড়ে পড়েছে। বীরভূমের ইলমাবাজারে এক প্রতিদ্বন্দ্বী বাবার মেয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা থেকে পাওয়া টাকাও লুট করেছে তৃণমূল, এখন চাপের মুখে তা ফেরত দিতে হয়েছে। আবার কোথাও শ্মশানযাত্রীদের কাছ থেকেও তোলার টাকা আদায়, রেগা, মিড ডে মিল থেকে লুট- সব হিসাব কড়ায় গন্ডায় বুঝতে নিতে স্থানীয় বাসিন্দারা, এমনকি তৃণমূলের কর্মীরাও জড়ো হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি, অফিসের সামনে। কারন যেখান থেকে লুট হয়েছে সেখানেই তো টাকা ফেরতের জন্য যাবেন মানুষ, স্বাভাবিক।

এই স্বাভাবিক নিয়মেই বাঁশবেড়িয়ার তৃণমূল কর্মী বছর দশের আগে দলনেত্রীর কালীঘাটের বাড়ির সামনেই গিয়ে ছিলেন, পরিণামে আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

চিটফান্ডের গ্রাসে জমানো সব টাকা, স্বপ্ন হারিয়ে সর্বস্বান্ত, অসহায়, বিপন্ন মানুষরাও ছয় বছর আগে জড়ো হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনেই। কেন?
এর জবাব দেওয়ার দায় তো এখন মুখ্যমন্ত্রীর-ই।

বিশ্ব-বাংলার কাটমানি ফেরত দেবে কে?...

কাটমানিরও ভিন্নতা আছে। বৈচিত্র্য আছে। সরকারী প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া থেকে যেমন কাটমানি মেলে তেমনি আবার স্রেফ শাসক দলের ক্ষমতার জোরেও তোলা আদায় করা হয়। ঠিক যেমন তৃণমূলের ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহের ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি। নিয়ম করে ফি মাসে আসানসোলে তাঁকে কিংবা তাঁর প্রতিনিধিকে কেন যেতে হয়, কেন অবৈধ ওপেন কাস্ট মাইনিং'র বিরুদ্ধে নীরব থাকতে হয়, তার উত্তর মমতা ব্যানার্জিও জানেন। না জানা থাকলে কয়লাঞ্চলে তাঁর দলে নেতা, মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেই টের পাবেন।

'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'। মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহের ভাইপোর সংস্থার নাম। সাংসদ হওয়ার আগে পর্যন্ত অভিষেক ব্যানার্জি-ই ছিলেন ''লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড'র কর্ণধার। অফিসের ঠিকানা বাসভবন চত্বরেই, ২৯/সি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের তালিকায় থাকা পাঁচজনের ঠিকানাই দেখানো হয়েছে, ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০২৬। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকানাতের একটি সংস্থার পাঁচজন ডিরেক্টর!!!

সরকারি বাস, ট্রাম, ওভারব্রিজ, ল্যাম্পপোস্ট, রাস্তা- গোটা শহরের আনাচেকানাচে সর্বত্র ছেয়ে গেছে 'বিশ্ব বাংলা' লোগোতে। মমতা ব্যানার্জির 'ব্রেইন চাইল্ড' বিশ্ব বাংলা লোগো। মুখ্যমন্ত্রী আঁকা লোগের ট্রেড মার্ক দাবি করলেন অভিষেক ব্যানার্জি। বিশ্ব বাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেড নামক সংস্থা তৈরির অনেক আগেই। মোদ্দা কথা মুখ্যমন্ত্রী 'ব' শব্দ দিয়ে ছবি আঁকলেন, সেই ছবিকে ট্রেড মার্ক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ট্রেড মার্কস রেজিস্ট্রির কাছে আবেদন জানালেন তাঁর ভাইপো। তাঁর নামেই বরাদ্দ হলো। তার অনেক পরে তৈরি হলো 'বিশ্ব বাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেড' নামক সরকারি সংস্থা। সরকারই সেখানে বিনিয়োগ করলো, আর সেই সংস্থা অভিষেক ব্যানার্জির 'বিশ্ব বাংলা' লোগোই ব্যবহার করলো। সরকারি সংস্থা বেসরকারিভাবে এক ব্যক্তির আবেদন করে পাওয়া লোগোকে ব্যবহার করলো। সরকারের বিনিয়োগে 'বিশ্ব বাংলা' ব্র্যান্ডের যে প্রচার,

প্রোমোশনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোগোটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার জন্য রয়্যালটি যাচ্ছে ভাইপোর ঘরে। অর্থাৎ ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে!

মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা হিজিবিজি ছবিও কোটি কোটি টাকায় চিটফান্ড কর্তা, ভুয়ো ও শিখন্ডী সংস্থার মালিকদের কিনতে বাধ্য করাটাও আসলে একপ্রকার তোলবাজি।

মমতার অডিট রিপোর্টেও দুর্নীতি এবং বোঝাপড়া...

চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্তেই এসেছে শাসক তৃণমূলের আয়-ব্যায়ের রিপোর্ট নিয়ে অসঙ্গতি। পড়েছে সি বি আই'র নোটিশ। সেই সূত্রেই তদন্তে তৃণমূলের অডিট রিপোর্টেও কেলেঙ্কারি। পড়েছে আয়কর দপ্তরের নোটিশ। আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডোবা দল।

সেই তৃণমূল যখন বিজেপি' সরকারের দুর্নীতির নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ার দেয়, আসলে তা নিজের ঘর রক্ষা করার সেটিং মাত্র। দুর্নীতিতে ডোবা বিজেপি বা দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন হুঁশিয়ারি দেন, পশ্চিমবঙ্গে সরকারের এলে চিটফান্ডেরত টাকা ফেরত দেওয়া হবে, তখন তা আসলে নিছকই 'হুঁশিয়ারি' মাত্র। আসলে শাসক তৃণমূলের পথই প্রশস্ত ও সুরক্ষিত করে দেওয়া। সি বি আই'র তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা আসলে চিটফান্ডের মত বড় কেলেঙ্কারিতে যুক্ত শাসক তৃণমূলকেই বৈধতা দেয়। নির্বাচনের সময় সি বি আই'র তৎপরতা শেষ বিচারে তৃণমূলের পক্ষেই 'ইতিবাচক' হয়ে ওঠে।

সারদা তদন্তের অগ্রগতির দাবি, চিটফান্ড কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ ফেরতের দাবি বা ' চোর ধরো জেল ভরো'র স্লোগান আসলে শাসক তৃণমূল ও বিজেপি'র বোঝাপড়ার কৌশল, ধান্দার ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়েরই অংশ।

চন্ডীগড় থেকে অমৃতসর, জলন্ধর থেকে ভাতিন্ডা- রাস্তাঘাট, হাটে বাজারে কোথায় মমতা ব্যানার্জির মুখ আঁকা তৃণমূলের পতাকা দেখতে পেয়েছে, পাঞ্জাবে এরকম

মানুষ খুঁজে পাওয়াও রীতিমত চ্যালেঞ্জ বটে। যদিও সেই পাঞ্জাবেই লোকসভা ভোটের আগে শুধুমাত্র পতাকা কিনতেই নাকি তৃণমূল কংগ্রেস খরচ করেছে ২কোটি টাকা! তাও আবার ২০১৩-১৪' সালে। ২কোটি টাকার পতাকা কেনা হয়েছে, তা যদি বিশ্বাসযোগ্যও হয় তাহলে সেই হিসাব সংশ্লিষ্ট বছরে তৃণমূলের আয় ব্যয়ের রিপোর্টে কেন উল্লেখ করা হলো না? বিস্মিত আয়কর দপ্তরও।

বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। তার আগে ২০১২ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করেই হরিয়ানার পাঁচকুলায় একটি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা হয় 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'র নামে। ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি- ১৩দিনের মধ্যে কয়েক দফায় ওই অ্যাকাউন্টে নগদে ৮৮লক্ষ ৪৪হাজার টাকা জমা পড়ে। কে সেই টাকা জমা দিলো? হরিয়ানায় তৃণমূল কংগ্রেস বলে আদৌ কী কিছু আছে, যদি থেকে থাকে তবে তৃণমূলের কতজন কর্মী কিংবা সমর্থক দলীয় তহবিলে এই টাকা জমা দিলো? এর চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন, ফেব্রুয়ারি মাসে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা নেওয়া হলে ২০১১-১২'র সালের আয় ব্যয়ের রিপোর্ট সেই অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব থাকলো না কেন?

দলীয় পতাকার খরচ দেখিয়ে কিংবা অ্যাকাউন্ট খুলে দেদার টাকা সরানোর খেলাই নয়, গুরুতর প্রশ্ন উঠে গেছে মমতা ব্যানার্জিসহ দলীয় নেতাদের হেলিকপ্টার খরচ নিয়েও! আয়কর দপ্তরের দাবি, গত লোকসভা নির্বাচনে হেলিকপ্টার চড়ার পিছনেই তৃণমূলের তরফে ১৫কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৫৫ টাকা খরচ করা হয়েছে। পবন হংস ও এয়ার কিং চার্টার– এই দুই সংস্থার কাছ থেকে হেলিকপ্টার ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। যে পরিমান টাকা আবার মেটানো হয়েছিল তার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা একেবারে নগদে দেওয়া হয়! যদিও এত বড় আর্থিক লেনেদেনের কোন বিষয়ই অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করেনি মমতা ব্যানার্জির দল। অডিট রিপোর্ট থেকে বেমালুম 'উধাও' ২৪কোটি টাকা।

রাজ্য রাজনীতিতে অনেক জল গড়িয়েছিল মনোরম কালিম্পঙের ডেলো রিসর্টে প্রবল ঠান্ডায় গভীর রাতের এক বৈঠককে ঘিরে। সি বি আই জেরার মুখে পড়ার

আগেই ২০১৫ সালের ১৩ই জানুয়ারি দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেই সেই ‘ডেলো কাণ্ড’র কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন মুকুল রায়। সি বি আই জেরার সামনে তা স্বীকার করেছিলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন। সি বি আই দপ্তরের বাইরে সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ্যেই তা স্বীকার করেছিলেন রোজভ্যালি কর্ণধার প্রতারক গৌতম কুণ্ডু। সেই মিটিং’এ হাজির থাকা আরেক তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষও প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেছিলেন। তারপরেও তদন্তের কোন স্রোতেই একটিবারের জন্যও একটি প্রশ্নের মুখেও পড়তে হলো মুখ্যমন্ত্রীকে। কেন?

কেন, ছাপান্ন ইঞ্চির ছাতির এই নিস্পৃহতা? কোন কোন সময় আবার বিশেষে তৎপরতা দেখিয়ে আসলে এত বড় দুর্নীতির ঘটনাকে ‘রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ বলার সুযোগ তুলে দেওয়া হচ্ছে কেন মমতা ব্যানার্জির হাতে? সারদা থেকে রোজভ্যালি, নারদ-তদন্তের প্রতিটি বাঁকে শাসক তৃণমূলের উপস্থিতি সত্ত্বেও কেন সিংহভাগ অভিযুক্তরাই বাইরে রয়েছেন?

দুর্নীতির ঘটনাকে তদন্তের আওতা থেকে বের করে এনে নিছকই রাজনৈতিক বিন্যাসের খেলায় পরিণত করা হলো কেন? দুর্নীতিতে আপাদমস্তক ডুবে থাকা তৃণমূলকে কী তাহলে ‘এসকেপ রুট’ দিচ্ছেন মোদী-অমিত শাহ’র সরকার? ছাপান্ন ইঞ্চি-ই কী তাহলে নিজেকে ‘রাফ অ্যান্ড টাফ’ বলে দাবি করা মুখ্যমন্ত্রীর রক্ষাকবচ হয়ে উঠছেন?

জবাবদিহি দিতে হবে নরেন্দ্র মোদী-মমতা ব্যানার্জিকেই। নোটবন্দী থেকে জি এস টি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে রাজ্যসভার ভোটের জুজু দেখিয়ে গড়াপেটার খেলা আড়াল করা যাবে না।

নোট বাতিলের কয়েক ঘণ্টা আগে রাজ্যে বি জে পি’র অ্যাকাউন্টে পুরানো নোট এক কোটি টাকা জমা পড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশে কোটি কোটি টাকায় অমিত শাহের নামে জমি কিনে নগদ টাকা খরচ করা, আবার নোট বাতিলের

সময়তেই জনধন যোজনায় সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গেই জমা পড়া- সবই আসলে একই খেলার অংশ।

২০১৯'র সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও তার পরেরদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশজুড়ে তখন এনআরসি বিরোধী প্রতিবাদ ক্রমেই দানা বাঁধছে। একই সঙ্গে গতি কমতে শুরু করে তদন্তেরও। একইসঙ্গে কেরালার মডেলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতে সি এ এ বিরোধী প্রস্তাব আনার বিরোধীদের দাবিও নাকচ করা হয়। দিল্লিতে বিরোধী দলগুলির বৈঠকও বয়কট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই মাঝে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর সফর, রাজ্যজুড়ে প্রবল বিক্ষোভের মাঝেও বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে বদল সারদা-রোজভ্যালি-নারদ কাণ্ডের তদন্তকারী আধিকারিকরা। বদলের তালিকায় রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিক্রির তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকও। অন্যদিকে নারদ কেলেঙ্কারিতে, তিন বছর পরেও এফআইআর রুজু হওয়া একজনকেও গ্রেপ্তার করে উঠতে পারলো না সিবিআই-ইডি'র মত কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এখন চলছে গোরু ও কয়লা পাচারের তদন্ত। শাসক দলে টাকা ঢুকেছে। পাচারের বৃত্তে আছে পুলিশ, বিএসএফ, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। গোরু পাচারের কিংপিন এনামুল থেকে কয়লা মাফিয়া অনুপ মাঝি ওরফে লালার সঙ্গে শাসক তৃণমূলের সখ্যতাও সামনে এসেছে। যত্ন করেই দু'মেরু বা বাইনারি সাজানো হচ্ছে।

সন্দেহের তালিকার বাইরে নেই সি বি আই!

সন্দেহের ওপরে রাখা যাচ্ছে না সি বি আই'কেও।

কেন মাথায় পৌছাতেই পাঁচ বছর সময় লাগছে! কেন সুপ্রিম কোর্ট বললেও 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে' রাঘববোয়ালরাই বাইরে! কেন চেরাপুঞ্জির মত আবহাওয়া সি বি আই' তদন্তে! কখনও রোদ কখনও বা মেঘ! খাঁচায় বন্ধ তোতাপাখি কিংবা সুপ্রিম কোর্টের কথায় 'ঘুন ধরা কাঠ' দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার হচ্ছে

এটা সত্য। সেই সত্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের তদন্ত দেখলে বিভ্রান্তি হতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। তদন্তে আসছে মুখ্যমন্ত্রীর নাম। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নিয়েও কেলেঙ্কারি, চিটফান্ড কর্তারা কিনেছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি, কালো টাকা বেমালুম সাদা হয়ে ঢুকেছে তৃণমূলের তহবিলে। তারপরে আজও সারদা কাণ্ডে, রোজভ্যালি কাণ্ডে চূড়ান্ত চার্জশিট দিয়ে উঠতে পারলো না সি বি আই। সিট'র মতই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও চিটফান্ডের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, নিলামে তুলে অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি।

চিটফান্ড কাণ্ড মানে শুধু শিলঙ বা ভুবনেশ্বর নয়। চিটফান্ড কাণ্ড মানে শুধু সারদা বা রোজভ্যালি নয়। ১৭০০টি সংস্থা। দু'লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। মোট এক কোটির ওপর প্রতারিত মানুষ।

দায়িত্ব বামপন্থীদের ওপরেই। আন্দোলনের অভিঘাতেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তদন্ত। আন্দোলনের চাপেই শুরু করাতে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া। 'যা গেছে, তা গেছে' বলে পার পেতে দেওয়া যাবে না

সি বি আই'র চেহারা কী তার আয়না হয়ে উঠতে পারে ২০১৯ সালের ২৩শে অক্টোবর।

তড়িঘড়ি তাঁর ডেনমার্ক সফর বাতিল করে দিলেন সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন (সি ভি সি)-র চেয়ারম্যান কে ভি চৌধুরি। ২৩শে অক্টোবরের রাতের ফ্লাইট বাতিল করে রাতেই জরুরি মিটিং ডেকে দিলেন সি ভি সি-র চেয়ারম্যান।

রাত সাড়ে এগারোটা– দিল্লি পুলিশ কমিশনার ফোর্সকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন মধ্যরাতে অপারেশনের জন্য। নয়াদিল্লির খান মার্কেটে জড়ো হতে বলা হল পুলিশ বাহিনীকে।

রাত বারোটা– এন এস এ' থেকে সবুজ সংকেত পেলেন দিল্লি পুলিশ কমিশনার। এরপরেই পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন সি বি আই অফিস দখল নেওয়ার।

রাত সাড়ে বারোটা– দিল্লি পুলিশ সি বি আই-দপ্তর ঘিরে ফেলে দখল নেওয়ার চেষ্টা চালানো। বাধা দিল সি আই এস এফ। পুলিশ কমিশনার সি আই এস এস-র প্রধানের সঙ্গে কথা বললেন। ততক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সি আই এস এস-র কাছে নির্দেশ চলে এল, বাধা দেওয়া যাবে না। শেষমেশ সি বি আই দপ্তরের দখল নিল দিল্লি পুলিশ।

রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটা– সি বি আই ডিরেক্টর অলোক ভার্মাকে তাঁর পদ থেকে সরকারের নির্দেশের খসড়া প্রস্তুত করে তা পাঠানো হলো নর্থ ব্লকে। সেখানে মধ্যরাতেও অপেক্ষায় পার্সোনাল দপ্তরের সচিব সি চন্দ্রমৌলি। খসড়া হাতে পাওয়ার পরেই তিনি ছুটলেন পি এম ও-তে। ক্যাবিনেট কমিটি এরপরেই অলোক ভার্মাকে সরানোর সুপারিশে সিলমোহর দেয় এবং এম নাগেশ্বর রাওকে সি বি আই ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়।

রাত আড়াইটে– সি ভি সি-র আধিকারিকরা ও নাগেশ্বর রাও হাসিমুখে বেরিয়ে আসছেন সি বি আই দপ্তর থেকে।

রাত পৌনে তিনটে– অলোক ভার্মাকে কাছে তাঁর অপসারণের নির্দেশ পৌঁছালো।

বাস্তবিকই বলিউডি চিত্রনাট্যও হার মানবে মধ্যরাতের এই রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের দৃশ্যপটের কাছে। কে কবে দেখেছে মধ্যরাতে সি বি আই অফিসের দখল নিয়ে নিয়েছে পুলিশ! সি বি আই-র ডিরেক্টরের টেবিল, ফাইল তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সি বি আই-র মতো একটি সংস্থাকে যেভাবে রাতের অন্ধকারে দখল নেওয়া হলো, যেভাবে মধ্যরাতে ডিরেক্টরকে অপসারণ করা হলো তা স্বাধীন ভারতে সরকারের স্বৈরাচারিতার ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেশবাসীর স্মরণে থাকবে অনেকদিন।

পরিস্থিতি এমনই যে, সুপ্রিম কোর্টকে বলতে হয়- 'কাঠে ঘুণ ধরলে কাঠের উপযোগিতাই নষ্ট হয়'!

ঘুণ ধরা কাঠ যেমন কাজে লাগে না তেমনি যে খাঁচায় বন্দি তোতাপাখিও নিজের কথা বলতে পারে না তেমনই জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টও। ইউ পি এ সরকারের আমলে কয়লার খাদান বরাত নিয়ে সি বি আই-কে কড়াভাষায় ভর্ৎসনা করেই সুপ্রিম কোর্ট দেশের প্রধান তদন্তকারী সংস্থাকে খাঁচায় বন্দি তোতাপাখির সঙ্গে তুলনা করেছিল।

সবচেয়ে আশঙ্কার জায়গা হলো সেটাই। বিশ্বাসযোগ্যতা কী হারাতে চলেছে সি বি আই? তাতে লাভবান কারা? রাফালের তদন্ত আটকে গেলে লাভবান কোন শিবির? সারদা-নারদের তদন্ত থমকে গেলে খুশী হবে কোন শিবির?

সি বি আই-র তৎপরতারও পছন্দ-অপছন্দ আছে!

নির্বিচারে সশস্ত্র শিবির থেকে গুলি চালাতে চালাতে মানুষ খুন করতে করতে নদীর পাড় ধরে জঙ্গলমহলের বিনপুরের বেলাটিকরির দিকে যে বন্দুকবাজ পালিয়ে গিয়েছিল, মাওবাদী-তৃণমূলীদের দাবি তাঁরই নাম নাকি ফুল্লরা মণ্ডল। অসুস্থ পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা এক হাতে বন্দুক নিয়ে গুলি চালাতে চালাতে মাঠ, খাল, বিল জঙ্গল পেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে– দুর্ধর্ষ এই অ্যাকশন চিত্র কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও মেনে নিয়েছে। তৃণমূল-মাওবাদীদের প্রকাশ্য মঞ্চ জনসাধারণের কমিটির এফ আই আর করে। একেবারে এফ আই আর ধরেই নেতাইকাণ্ডে সি বি আই তদন্ত। চার্জশিট, গ্রেপ্তার সি পি আই (এম)-র নেতা সংগঠক।

অথচ ক্যামেরার সামনে হাত পেতে ঘুষ নেওয়ার পরেও সেই দৃশ্য সঠিক কিনা তা এখনও মেনে নিতে পারেনি সি বি আই! তাই তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তারেরও কোন সম্ভাবনা এখনও উঁকি মারেনি। ষাটোর্ধ্ব ফুল্লরা মণ্ডল এক হাতে বন্দুক নিয়ে গুলি চালাতে চালাতে পালিয়েছে– সেটা সি বি আই-র কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে অথচ গোপন ক্যামেরার সামনে লক্ষ লক্ষ টাকা স্রেফ হাত পেতে ঘুষ নিচ্ছে তৃণমূলের এক ডজননেতা, মন্ত্রী, সাংসদ। তবুও নাকি যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। একবছর ধরে চলছে তৃণমূলনেতার গলার স্বর পরীক্ষা! তারপরেও নারদ ঘুষকাণ্ডে গ্রেপ্তারির পথে এগতে পারছে না সি বি আই!

তবে গোটাকাণ্ডে যেভাবে সি বি আই-র স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে তাতে সারদা-রোজভ্যালি তদন্তে শাসক তৃণমূলের আপাতত সুবিধা হয়েছে বলেই মনে করার খুবই সঙ্গত কারণ রয়েছে। যেখানে তদন্তকারী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাই বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে সেখানে সেই তদন্তে অভিযুক্তদের অপরাধ জনমানসে অনেকটাই লঘু হয়ে যায়।

কিন্তু ছয় বছর ধরে যেভাবে বারে বারে সি বি আই-র বিরুদ্ধে চিট ফান্ড তদন্তে শ্লথতার অভিযোগ ওঠে, যেভাবে বারেবারে তদন্ত প্রক্রিয়া থমকে যায় তাতে সামগ্রিক তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। সুবিধা পাচ্ছে তৃণমূল! সুবিধা কী করে দেওয়া হচ্ছে? কেন তদন্তের ছটি পর্যায়ে মমতা ব্যানার্জির নাম এলেও সে বিষয়ে কোনও তৎপরতা নেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার? কেন তৃণমূলের চার বছরের আয়-ব্যয়ে বিস্তর অসঙ্গতি দেখার পরেও চুপ সি বি আই? কেন গত চার বছরে সারদা ও রোজভ্যালিকাণ্ডে চূড়ান্ত চার্জশিট পর্যন্ত দেওয়া গেল না? কেন সারদা ও রোজভ্যালির কর্ণধার ছাড়া বাকি সকলেই জামিন পেয়ে গেল? কেন নারদকাণ্ডে বারোজন তৃণমূলনেতা ও একজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফ আই আর হওয়ার পরেও কাউকে গ্রেপ্তার করা গেল না?

এই চাপানউতোরের মাঝেই তাই ফের সামনে এসেছে গত চার বছর ধরে এরাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রতারিত আমানতকারী ও এজেন্টদের সেই প্রশ্ন, তদন্তের কী হলো? ক্ষতিগ্রস্তরা কী তাঁদের অর্থ ফেরত পাবে?

সিবিআই কী তবে এই মুহূর্তে শাসক বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষাকারী সেতুর ভূমিকায়?

দুর্নীতির ঐক্য...

লকডাউনের মাঝেই সঙ্কেটর মাত্রা দ্বিগুণ হয় আমফানের তান্ডবে। দক্ষিণ ও উত্তর ২৪পরগনার লোনা মাটি, সুন্দরবন, উপকূলবর্তী মেদিনীপুর সহ একাধিক জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আকাশে চক্কর কাটেন মমতা

ব্যানার্জি। পরিস্থিতি বদলায় না। একমাস পরেও উত্তর ২৪পরগনার বসিরহটা, হিঙ্গলগঞ্জে অটোর মধ্যে, রাস্তার ধারে ফুটপাতেই অস্থায়ী ঠিকানায় দিন কাটাতে হয় হাজারো মানুষকে। আর ক্ষতিপূরণ? চাল থেকে ত্রিপল, শুকনো খাবারও লুটেছে তৃণমূল। ক্ষতিপূরণের টাকা লোটাতেও দেখা গেছে তৃণমূল-বিজেপি ঐক্য!

কেমন সেই ছবি? বিদ্যাধরীর তীরেই মিনাখাঁর মোহনপুর। মোহনপুর এলাকার একটি গ্রাম হরিণহোল।

হরিণহোল গ্রামেই একসঙ্গে রাতের অন্ধকারে বসেছেন দীনবন্ধু পাত্র, চিত্তরঞ্জন পাত্র, জগদীশ দাসরা। একসঙ্গেই বৈঠক। হাতে তালিকা। আমফানের 'ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের' তালিকা! তালিকা মোতাবেক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যে ঢুকেও গিয়েছে কুড়ি হাজার করে টাকা। স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তির ছবি ধরা পড়ার কথা ছিল হরিণহোলায়। কিন্তু ঘটলো উলটোটাই, হরিণহোলা সহ মিনাখাঁর বিস্তীর্ণ তল্লাট জুড়ে ক্ষোভের বিস্ফোরণ!

দীনবন্ধু পাত্র, জগদীশ দাসদের পরিচয়টাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। দীনবন্ধু পাত্র হরিণহোলার দাপুটে বিজেপি নেতা। দিলীপ ঘোষের অনুগামী। চিত্তরঞ্জন পাত্র দাপুটে তৃণমূল নেতা। জগদীশ দাসও তৃণমূলের দাপুটে নেতা, ধনী। আছে ইটভাটা, মাছের ভেড়ি। 'যুবরাজ' অভিষেক ব্যানার্জির অনুগামী।

তালিকা তৈরি হয়েছে দুই দলের যৌথ সম্মতিতে। একসঙ্গেই হয়েছে বৈঠক। শুধু এই গ্রামেই ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ৫০৫। গরিব মানুষ, কাঁচা ঘর, বাড়ি সর্বস্ব খুইয়েছে মানুষজন। তবে তালিকা হয়েছে ১২২জনের। ১২২জনের অ্যাকাউন্টেই টাকা ঢুকেছে কুড়ি হাজার করে। খোদ পঞ্চায়েতের এক তৃণমূলী কর্মাধ্যক্ষের কথায়, 'আমাদের এখানে এসব গণ্ডগোল নেই। সবাই মিলে বোঝাপড়া করে তালিকা হয়েছে। বিজেপি'র ৫৫জন, বাকিটা আমাদের'! ১২২জন 'ক্ষতিগ্রস্ত'র অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। সেই নামের তালিকা ভাগাভাগি হয়েছে। বিজেপি'র ৫৫জন, তৃণমূলের ৬৭জন!

মিনাখাঁর ৮টি পঞ্চায়েতই তৃণমূলের দখলে। লুটের পঞ্চায়েতে ভোট। বিরোধীরা বিশেষত সিপিআই(এম)'কে কোথাও মনোনয়নই তুলতে দেওয়া হয়নি। বিজেপি কিন্তু অনায়াসে মনোনয়ন তুলেছিল, কয়েকটি আসনে জিতেও ছিল। মোহনপুর পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। তৃণমূলের ১১জন সদস্য, বিজেপি'র ৩জন, নির্দল একজন। হরিণহোল গ্রামে বিজেপি'র নির্বাচিত সদস্য। মোহনপুরে ঢুকতেই একাধিক গ্রামবাসী, মহিলারাই সেই রহস্য স্পষ্ট করলেন। মোহনপুর অঞ্চলের যে ১১টি গ্রামে তৃণমূলের সদস্য সেখানে তালিকার একশোভাগই শাসক দলের লোক। আর যে তিনটি অঞ্চলে বিজেপি'র সদস্য সেখানে একেবারে ব্লকস্তর থেকে বোঝাপড়া, তালিকার ৫০ শতাংশ নাম তৃণমূলের, বাকি ৫০ শতাংশ বিজেপি'র। বিনিময়ে, গোটা ব্লকের কোথাও ক্ষতিপূরণ নিয়ে দুর্নীতির ইস্যুতে বিজেপি কোনও প্রতিবাদ, মিছিল, বিক্ষোভ করবে না। একইভাবে বিজেপি'র অঞ্চলের ক্ষতিপূরণের দুর্নীতি নিয়ে কোনও পালটা প্রচার হবে না। একেবারে দিনের আলোয় চলছে এই বোঝাপড়া। শহর কলকাতা থেকে মাত্র ৪৪কিলোমিটার দূরে। ক্ষতিপূরণের দুর্নীতিতে এক বেনজির ঐক্যের ছবি, তৃণমূল-বিজেপি'র।

করোনার জেরে লকডাউন পর্বে গোটা রাজ্যেই রেশনের চাল চুরির অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সুন্দরবনের একাধিক জায়গায় সরকারের তরফে আমফানের ক্ষতিগ্রস্তদের কুড়ি হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণার পরে তালিকায় নাম তোলার জন্য হাজার পাঁচেক টাকা নেওয়া হচ্ছে এমন ঘটনাও ঘটছে। এমনকি একাধিক জায়গায় ত্রিপল নিয়ে দুর্নীতি, ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে না ক্ষতিগ্রস্ত গরিব মানুষদের। সেই ত্রিপল বেচে দেওয়া হচ্ছে বাইরে।

আবার দুর্নীতির নতুন নতুন কৌশলও যে তৃণমূল প্রতিদিন উদ্ভাবন করছে অনেক জায়গায় তার প্রমাণ মিলেছে। যেমন হুগলীতে। ভুয়ো মাস্টাররোল দেখিয়ে টাকা তোলা, জব কার্ড হাতিয়ে নিয়ে, প্রকল্প না হলেও কাগজে কলমে তা দেখিয়ে টাকা তোলা, ইন্দিরা আবাসের প্রকল্প থেকেও কাটমানি খাওয়া– এসব রাজ্যের প্রতিটি জেলায় স্বাভাবিক চিত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমফানের ক্ষতিপূরণ নিয়ে হুগলীতে দেখা গেল দুর্নীতির কৌশল নিয়েও শাসক তৃণমূল যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

আমফানের ঝড়ে ক্ষতি হয়েছে হুগলীর কিছু এলাকা। তারমধ্যে অন্যতম চণ্ডীতলা ২নম্বর ব্লকের গরলগাছা গ্রাম। আমফানের পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা এখানে তৈরি হওয়ার পরেই শুরু হয় হইচই। শাসক দলের ঘনিষ্ঠজনদের নাম ঢোকানো হয়েছে তালিকায়। তাতে পঞ্চায়েত প্রধানের স্ত্রী থেকে আত্মীয়, ঘনিষ্ঠদের নামই রয়েছে। যাদের সকলেরই রয়েছে পাকা বাড়ি, কারো কারো দোতলা পেল্লাই বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্তদের সেই তালিকায় চোখ বোলালেই দেখা যাচ্ছে 'ক্ষতিগ্রস্ত' ব্যক্তিদের নাম, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নাম্বার, আইএফসি কোড নম্বর দেওয়া রয়েছে। সবার শেষ কলমে রয়েছে মোবাইল নম্বর। কিন্তু কী আশ্চর্য! তালিকায় থাকা ক্ষতিগ্রস্তদের সবার মোবাইল নম্বর একই! শেষ চার সংখ্যাও এখানে উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছে-৫৭০৯। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর আলাদা, ঠিকানা আলাদা, আইএফএসসি নম্বর আলাদা, শুধু প্রত্যেক 'ক্ষতিগ্রস্ত'র মোবাইল নম্বর একই! ঐ মোবাইল নম্বরটি তাহলে কার? কেন লিস্টে শুধু এই নম্বরটি দেওয়া হয়েছে?ঐ মোবাইল নম্বরটির মালিক মনোজ সিংহ। মনোজ সিংহ গরলগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, এলাকার তৃণমূল নেতা। সবার নামের পাশেই পঞ্চায়েতের প্রধানের নম্বর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমফানে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যারই অ্যাকাউন্টে সরকারের তরফে কুড়ি হাজার টাকা ঢুকবে সেই মেসেজ অ্যালার্ট যাবে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের মোবাইলে! এই তালিকা কীভাবে অনুমোদিত হতে পারে, উত্তর নেই প্রশাসনের কাছেও। পরে যদিও প্রবল প্রতিক্রিয়ার মুখে বাধ্য হয়ে সেই তালিকা বাতিলে। কিন্তু আমফান আক্রান্ত অন্যান্য জেলায় হাজারো দুর্নীতির ঘটনা ঘটলেও সরকার-প্রশাসন চোখ বুঁজে।

করোনার কিট পাচার...

আমফানের ত্রানের চাল, ত্রিপল নিয়ে কেলেঙ্কারি দেখেছে রাজ্যবাসী, লকডাউন পর্বেই। আনলক পর্বে করোনা টেস্টের কিট পাচারের রমরমা ব্যবসায় শাসক তৃণমূল- এছবিও দেখতে হয়েছে রাজ্যবাসীকে। কোভিড টেস্ট ও একশো শতাংশ লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠতে পারে– এমন দূরতম কল্পনার বিষয়কেও বাস্তবে প্রমাণ করছে প্রশাসন ও শাসক দলের নির্দিষ্ট আঁতাত।

স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যন্ত এলাকায়, গ্রিন জোনে হচ্ছে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট। এবার সেই র‍্যাপিড টেস্টের জন্য স্থানীয় এলাকায় শিবিরের দায়িত্ব ঘুরপথে যাচ্ছে পঞ্চায়েতের হাতে। কাদের পরীক্ষা হবে তালিকা করছে শাসক দলে। এমনই সেই তালিকা যাতে সিংহভাগ মানুষ শিবিরের পরীক্ষার অনুপস্থিত থাকছেন। তারপর অব্যবহৃত কিট বেমালুম শাসক দল ও প্রশাসনের যোগসাজেশে বোমালুম চলে যাচ্ছে খোলাবাজারে। লক্ষ লক্ষ টাকা কারবার চলছে কোভিডের কিট নিয়ে। দক্ষিণবঙ্গের হুগলী জেলা। নির্দিষ্ট চারটি ব্লক। মগরা, পান্ডুয়া, আরামবাগ, গোঘাট। ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, মালদা, দিনাজপুর- একাধিক জেলায় এলকাধিক ব্লকে গত প্রায় চার সপ্তাহ ধরে চলে এই রমরমা কারবার। সরকার গত বছরের আগস্ট মাস থেকে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে জোর দিয়েছে। আগস্ট মাসেই প্রায় ছয় লক্ষ র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন কিটের বরাত দিয়েছে। যে পরিমাণ কিট তৈরি হচ্ছে সেই মোতাবেক স্বাস্থ্য ভবনের তরফে জেলাগুলিতে ব্লক ধরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় তা সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য প্রশাসন নয়, সাধারণ প্রশাসনের মাধ্যমেই তা হচ্ছে। এবার নির্দিষ্ট সেই ব্লকে বিডিও কে বলা হচ্ছে একদিনে সেই ব্লক এলাকায় নির্দিষ্ট দুটি জায়গায় ক্যাম্প করা হোক র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের। ব্লক আধিকারিক সেই মোতাবকে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কে তা জানালো। যেন সেই অপেক্ষাতেই বসে ছিল শাসক দলের পঞ্চায়েত। কোভিডের বাজারে সামনে এলো সুবর্ণ সুযোগ। শাসক দলের পঞ্চায়েতের তরফে ঠিক করে দেওয়া হলো দেড়শো জনের নাম যারা ঐ ক্যাম্পে বিনা পয়সায় কোভিড টেস্টের জন্য আসবেন। তালিকা তৈরি হচ্ছে শাসক দলের পঞ্চায়েত অফিসে তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতিতে। ক্যাম্পের দিন দেখা যাচ্ছে, ঐ দেড়শোর জনের মধ্যে সর্বোচ্চ তিরিশ জন হাজির হয়েছেন পরীক্ষার জন্য। ইতিমধ্যে কতজন পজিটিভ দেখানো যাবে তাঁর সংখ্যা বেঁধে দেওয়া আছে। পাঁচজন পজিটিভ দেখানো যাবে ঐ ক্যাম্প থেকে। প্রথম কুড়ি জনের মধ্যেই পাঁচজন পজিটিভ হওয়ায় বাকী দশজনের পরীক্ষাও আর করা হচ্ছেনা। ঐ দশজন ‘বিনা পরীক্ষায়’ নেগেটিভ হলে। ১২০ জন ক্যাম্পেই আসেননি। অথচ সরকারের তরফে ঐ ক্যাম্পে ১৫০টি র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কিট পাঠানো হয়েছে। তাহলে হাতে রইলো মোট ১৩০টি অব্যবহৃত অ্যান্টিজেন টেস্ট কিট। সরকারের খাতায় যদিও তা ‘ব্যবহৃত’। এবার শাসক দলের হাতে এলো সেই ১৩০টি কিট। বাজারের মূল্য ১২৫০ থেকে ১৩০০ টাকা। সেটাই তৃণমূলের সৌজন্যে আটশো থেকে হাজার

থেকে বিক্রী করে দেওয়া হলো ব্লক এবং লাগোয়া একাধিক ওষুধের দোকানে এমনকি বেসরকারি হাসপাতালেও।

দিনের দুটি শিবির। হাজার টাকা করে কিট বিক্রি করলেই আড়াই লক্ষ টাকা। গত এক মাসে এই টাকার পরিমান একেকটা জেলায় ন্যূনতম ৫০ লক্ষ টাকা। কোন কোন জেলায় পরিমান ১কোটি ছাড়িয়েছে।

কয়লা-গোরু পাচারেও শাসক দল...

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুখে নজিরবিহীন ভাবে কয়লা মাফিয়ার নাম। কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে কয়লা-মাফিয়া অনুপ মাঝি ওরফে লালার নাম উল্লেখ করেই মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশ্যে অমিত শাহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছিলেন, 'লালাকে গ্রেপ্তার করেছে বলে এত সমস্যা কেন হচ্ছে মমতাদির? কয়লার রেভিনিউ তো রাজ্যও পায়। তাহলে ওনার এত রাগ কেন?' তার আগে মমতা ব্যানার্জিও সাংবাদিক বৈঠকে নজিরবিহীনভাবে কয়লা মাফিয়ার অফিসে কেন্দ্রীয় সংস্থার তল্লাশির বিরোধিতা শুরু করেন দেন।

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলা সফরের মাঝেই গত নভেম্বর কয়লা গোরু পাচারের তল্লাশি গতি পায়। গ্রেপ্তার হয় গোরু পাচারের কিংপিন এনামুল হক। তৃণমূল সরকারের আসার পর থেকে ২০১৩সাল থেকেই গোরু পাচারে হাত পাকায় এই ব্যক্তি। বছর দুয়েকের মধ্যেই গোরু পাচার চক্রের একচ্ছত্র পাণ্ডায় পরিণত হয়। পাচার চক্রের কাজে মোটা টাকার বিনিময়ে একাংশের বিএসএফ আধিকারিকদেরও কাজে লাগায় এই ব্যক্তি। ২০১৬সালের বিধানসভা নির্বাচনে রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে সরাসরি ভোটে কাজ করে এনামূল ও তাঁর সশস্ত্র বাহিনী। এনামুল হককে গত লোকসভা ভোটেই তৃণমূলের হয়ে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। মুর্শিদাবাদের লালগোলার বাসিন্দা এনামুল দ্রুতই হয়ে উঠেছিল তৃণমূলের ফান্ড ম্যানেজার। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটেও জঙ্গীপুরের তৃণমূলী সাংসদ খলিলুর রহমানের সঙ্গে একের পর এক নির্বাচনী সভায় দেখা গেছে তাকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সন্ত্রাস, ভোট লুঠ চালায় এই এনামূলের বাহিনী। ইতিমধ্যে কলকাতায়

একেবারে তৃণমূলের ক্ষমতার বৃত্তে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তৃণমূলে দু'নম্বর ক্ষমতাশালী নেতার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়। গোরু পাচার চক্র আরো বেপরোয়াভাবে কাজ চালাতে শুরু করে। তৃণমূলের একাধিক নেতার সঙ্গে তার আর্থিক লেনদেনের তথ্যও সিবিআই আধিকারিকদের হাতে আসে। সেই লেনদেনের তথ্য ঘাঁটতে গিয়েই এমন নথি হাতে এসেছে যা নাভিঃশ্বাস বাড়াতে পারে কালীঘাটেও। লালগোলা থানার নশিপুর পঞ্চায়েতের কুলগাছির রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা এনামূল হক। শ্রম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের সঙ্গেও এনামূল বাহিনীর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে খবর। গোরু পাচারের কারবারে একাধিক বিএসএফ আধিকারিকের নামও সামনে আসে। বিএসএফের এক কমান্ডান্ট গ্রেপ্তারও হয়।

কয়লা মাফিয়া অনুপ মাঝি ওরফে লালা এখনও ফেরার। সিবিআই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, লুক আউট নোটিশ জারি করেছে। কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি করেই প্রশাসন-পুলিশ-শাসক দল মদত দিয়েছে কয়লা পাচারে। কয়লা ও গোরু পাচারে মানি লন্ডারিংয়ের মামলা রুজু করে সিবিআই'র পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডাইরক্টরেটও তদন্ত শুরু করেছে। গত ১১ জানুয়ারি কলকাতা একাধিক প্রান্ত সহ মোট ১৪টি জায়গায় সকাল থেকে ঝটিকা তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি'র ১৫টি দল একযোগে। গড়িয়া থেকে কড়েয়া, বেন্টিক স্ট্রিট, বাঙুর, লেকটাউন, কোন্নগর, রানিগঞ্জ, আসানসোল সর্বত্র চলে তল্লাশি অভিযান। ইতিমধ্যে লালার পুরুলিয়া, দূর্গাপুর, কলকাতা, আসানসোলের অফিস থেকে উদ্ধার হওয়া নথি যাচাই করে তালিকা তৈরি করেছে সিবিআই। মানি লন্ডারিং বা কালো টাকা ধোলাইয়ের গুরুতর অভিযোগের পাশাপাশি কলকাতা শহরে ভুয়ো সংস্থার জাল তৈরি করার তথ্যও সামনে এসেছে। যেমন দেখা গেছে কয়ালাঞ্চলের নির্দিষ্ট একটি থানাকে মাসে ৪ কোটি টাকা দেওয়া হতো। আবার, প্রতি মাসে কলকাতায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় আসতো নগদ প্রায় ২৭ থেকে ৩০ কোটি টাকা। রাতে পুলিশি পাহারায় নগদ টাকা ভর্তি গাড়ি দুর্গাপুর হয়ে আসতো দক্ষিন কলকাতায়, নির্দিষ্ট ঠিকানায়। শুধু রানিগঞ্জ, আসানসোল ও লাগোয়া বাঁকুড়ার অবৈধ খাদান থেকেই সেই নগদ 'প্রসাদের পরিমান' প্রায় কোটি, প্রতি মাসে। কেন্দ্রীয় সংস্থার সুত্রে জানা গেছে প্রায় ১৬০টি মত ভুয়ো সংস্থা রয়েছে কয়লা মাফিয়া লালার। ঐ শিখন্ডী ও ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে রানীগঞ্জ, আসানসোল, জামুড়িয়া, বীরভুম,

বাঁকুড়া ও ঝাড়খন্ডের একাধিক বেআইনী খাদানের কোটি কোটি টাকা খেলানো হত। শুধু কয়লা নয়, বিভিন্ন কোম্পানির নামে ১৫০কোটি টাকার ইক্যুইটি শেয়ার কিনেছিল লালা, সবই ভুয়ো, কাগজে-কলমে। সেই টাকা হুন্ডির মাধ্যে পাচার হয়। তার একটা অংশ প্রভাবশালী মহলের কাছে পৌছয়, সেই তথ্যও হাতে এসেছে।

এখনও পর্যন্ত দলের তরফে আন্তর্জাতিক স্তরে পাচার কান্ডে যুক্ত এই ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তৃণমূলের তরফে। মুখে কুলুপ এঁটেছেন ভাইপো সাংসদও। বিনয় মিশ্রের মাধ্যমেই কয়লা ও গোরু পাচারের টাকা প্রভাবশালী মহলে যেত, তৃণমূলের অন্যতম ক্ষমতাবান সাংসদের স্ত্রীর সিঙ্গাপুর ও দুবাইয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টনেও সেই টাকা পৌঁছেছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সিঙ্গাপুরে একটি হোটেলের খোঁজ মেলে পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল তৃণমূলের অন্যতম ক্ষমতাবান এক নেতার আত্মীয়ার নামে। এখন গোরু পাচারের তদন্তেও আশ্চর্যজনকভাবে সেই হোটেলের বিনিয়োগের তথ্য সামনে এসেছে ফের। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি সূত্রের দাবি, গোরু পাচারের টাকাও বেমালুম ঢুকেছে এখানে। এমনিক তড়িঘড়ি ৫০ কোটি টাকায় ব্যাঙ্ককের একটি হোটেলও বেচে দেওয়া হয়েছে। ঐ প্রভাবশালী তৃণমূলের হয়ে সামনে থেকেছেন বিনয় মিশ্র। দুবাইতে নতুন হোটেল কেনা, ব্যাঙ্ককের হোটেল বিক্রি করা গোটা প্রক্রিয়ায় ছিলেন বিনয় মিশ্র। গত ৩১ ডিসেম্বর কালীঘাট ও রাসবিহারীতে তাঁর দুটি বাড়িতে তল্লাশিও হয়।

নিয়োগে দুর্নীতি...

রাজ্যে উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগেও বেনজির দুর্নীতির ছবি। কলকাতা হাইকোর্টই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়। আদালত বাতিল করে দিয়েছে সরকারের তৈরি করা প্যানেল এবং মেরিট লিস্ট। উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বেআইনি কাজ হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে তা খুব স্পষ্ট। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আদালত নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন নিয়োগের নির্ঘন্টও তৈরি করে দিয়েছে।

২০১৪ সালে উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে শুরু করে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন বিধি এসএসসি মানেনি। প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন, ইন্টারভিউ, মেরিট লিস্ট তৈরি করা এবং প্যানেল প্রকাশের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা হয়েছে। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা হাইকোর্ট এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল কমিশন। কলকাতা হাইকোর্টে এই নিয়োগ মামলার বিরুদ্ধেই প্রায় ১৪ হাজার আবেদনকারী ছিলেন। ৭ বছর অসংখ্য যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরিপ্রার্থীদের বঞ্চিত করল। অনেকের বয়স বেড়ে গেলো। আর পরীক্ষায় বসা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী যতই বলুন "তুই কে যে হিসাব চাইবি?" হিসাব আপনাকে দিতেই হবে। ছাড় পাবেন না মামলার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা কারবারিরাও।

দশ লাখে চাকরি আছে। মেধার চাকরি নেই। তাই চার বছরের সন্তানকে কোলে নিয়ে মেধাবী মা'র ঠাঁই হয়েছে খোলা আকাশের নিচে। তিন দশকে এ'চিত্র দেখেনি শহর, রাজ্যবাসী। রাজ্য থেকে পালাচ্ছে শিল্প। চাকরির জন্য হাপিত্যেশ হয়ে ঘুরছেন যুবক-যুবতী। নিয়োগ নিয়ে হাহাকার সর্বত্র। রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চাকরির অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল শিক্ষকতার পেশা। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু হলে কী হবে! শাসকদলের দপ্তর থেকে যেখানে নিয়োগের তালিকা তৈরি হয়, সেখানে বৃষ্টি মাথায় সন্তানসম্ভবা যুবতী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাবেন, এমনই ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের। গত সাত বছরে যেখানে সাতবার শিক্ষক নিয়োগ হওয়ার কথা ছিল, সেখানে হলো একবার। ২০১১সালে প্রাথমিক ও এসএসসি'র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। নিয়োগ পরীক্ষার দিনে একাধিক জায়গায় প্রশ্নপত্র পৌঁছালো না। পরীক্ষা দিতে পারলেন না অনেকেই। তারপর নানা জটিলতায় নিয়োগ বন্ধ থাকল। ২০১২ সালে ডিসেম্বর মাসে নিয়োগ হলো। সেই নিয়োগ থেকেই প্রকাশ্যে এলো শাসকদলের স্বজনপোষণ, দুর্নীতির ঘটনা। শিক্ষক নিয়োগের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠল 'তৃণমূল ভবন।

‘দুঃসময় থেকে সুসময়ে মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে’

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই থেকে জনজীবনের ইস্যু। কৃষকের ফসলের ন্যূনতম দামের অধিকার থেকে বিলগ্নির মুখে পড়া কারখানার শ্রমিকের লড়াই– সিঙ্গুু, গাজিপুর সীমান্ত থেকে এই বাংলার আলপথ। কোভিড পর্ব কাটিয়ে আমফানের বিপর্যয়– মানুষের পাশে, লড়াইয়ের রাস্তায় বামপন্থীরাই। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রক্ষা, খাদান বাঁচাতে প্রতিবাদ, ধর্মঘট, গ্রেপ্তারির চেনা পথে, নদী বাঁধ মেরামতে কোদাল হাতে বামপন্থীরাই। ‘নিউ-নর্মাল’ প্রতিবাদের ধরন বদলে দিতে পারে, শ্রেণি রাজনীতিকে নয়।

শাসকের ভাষ্য ভেঙে জনগণের ভবিকল্প ভাষ্য তৈরি সময়ের দাবি, অগ্রাধিকারও বটে।

মহামারীকে ঢাল করে যেভাবে জনগণের রুটি-রুজির ওপরে আঘাত নামিয়ে আনা হচ্ছে, যেভাবে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ বৃহৎ কর্পোরেটের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তার প্রতিবাদে গোটা দেশজুড়ে নিরন্তর লড়াইয়ের রাস্তায় সামনে বামপন্থীরাই। স্পষ্ট দাবি। বিকল্পের উচ্চারণও স্পষ্ট।

উল্টোদিকে পরিকল্পিত মেরুকরণের রঙিন চিত্রনাট্য প্রস্তুত। শাসকের মরজি মতো মিডিয়ায় সাজানো হচ্ছে বাইনারি– ‘হয় তুমি তৃণমূল, নয় তুমি বিজেপি’।

আপনাকে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দুই সরকার।

আমাদেরই সামনে আনতে হবে বিকল্প ভাষ্য। একইসঙ্গে প্রত্যাঘাত, দ্রুত এবং সরাসরি। দুর্নীতি রাজনীতির স্বাভাবিক গন্তব্য হতে পারে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন, সর্বস্ব খুইয়েছে প্রতারণার জালে। সিবিআই জেরার ওপর নির্ভর করে দলবদলের খেলা নেয়। দুর্নীতিতে ফেঁসে গিয়ে রাজ্যসভায় সমর্থন যুগিয়ে এই

বাংলায় লোক দেখানোর ‘কুস্তি’ নয়। এ’বাংলাকে দুর্নীতিমুক্ত সরকার উপহার দিতে পারে একমাত্র বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি।

ব্যারিকেডের ওপারে কায়েমি স্বার্থে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে চলা স্বৈরাচারী-দুর্নীতিগ্রস্ত- সাম্প্রদায়িক শক্তি।

ব্যারিকেডের এপারে জনগণের স্বার্থেই লড়াইয়ে থাকা বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি।

মুখোশে আড়ালে নয়, লড়াই মুখোমুখি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড সুখেন্দু পাণিগ্রাহী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং এস পি কমিউনিকেশনস, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৫ টাকা